শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ও মার্কসবাদ

(তৃতীয় খণ্ড)

পার্থসারথি গায়েন

প্রভা প্রকাশনী
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
১কে, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা-১২

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও মার্কসবাদ

'মরিব মরিব কৌশল করিয়া মরিব।'

শোনা যায় যুক্তি হেরোদের এমন একটা উক্তি। সংশয়বাদীরা এবার মনে মনে যুযুৎসুর প্যাঁচ কষে বললেন—আমাদের তো নানাভাবে নাস্তানাবুদ করছেন। কিন্তু মার্কসপন্থীরা বা কমিউনিস্ট ও বামপন্থীরা গীতার বিরুদ্ধে যেসব সজারু সদৃশ কাঁটা ফোটায় মাঠে ময়দানে তার সঠিক উত্তর কি আছে আপনাদের ঝুলিতে? আপনারা তো মার্কসবাদকে ভয় পান। মার্কসপন্থীদের এড়িয়ে চলেন। বামপন্থী ও কমিউনিস্টদের যুক্তি ও বক্তব্যের ধারে ভেসে যায় আপনাদের আবেগ। টুটে যায় ভাবের ফানুস। তাদের রুদ্রতেজে উবে যায় কুয়াশার অ-জমাট বাষ্পকণা।

গীতাধ্যানীরা কিছুক্ষণ নিবিড়ভাবে ভাবলেন। তারপর মৃদুকণ্ঠে প্রত্যুত্তর দিলেন সবিস্তারে। আমরা কাউকে এড়িয়ে যাই না। মাড়িয়েও না। শিকাগো শহরে ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে মহাধর্মসভায় স্বামী বিবেকানন্দ যে যুগান্তকারী বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার প্রায় প্রারম্ভে তিনি একটি অমোঘ ও চিরসত্য বাণী উচ্চারণ করেছিলেন।

"I have come from a religion which not only tolerates all religions but accepts all religions as true."..... আমি যে ধর্মমতের প্রবক্তা সে ধর্ম শুধু সব ধর্মকে সহ্য করে বা স্বীকৃতি দেয় না, সব ধর্মকে সত্য বলে মান্যতা দেয়। আমরা সেই বীর সন্ন্যাসীর বাণীকে আরও একটু পরিস্ফুট করে বলতে চাই—আমরা শুধু সব ধর্মমত, সব ধর্মপথকে সহ্য করি বা স্বীকৃতি দিই না আমরা সব ধর্মকে যথাযোগ্য সম্মাননাও দিই। প্রণতি জানাই। তার মধ্যে যে সত্য আছে তা থেকে প্রণোদিত হই। আমরা চাই না দৃষ্টির মায়াভ্রমে সৃষ্টির সত্য তত্ত্ব বিকৃত হোক। আমরা চাই কোনো খণ্ডিত জ্ঞান নয়। কোনো মোহ আবরণ নয়। আমরা চাই নিকষিত হেম। নিষ্কলুসিত প্রেম। আবেগ নয়। উচ্ছ্বাস নয়। নানা দিক দর্শনের আলোকে আলোকিত সমুজ্জ্বল সত্য। চিরন্তন সত্য।

তোমরা যে মার্কসবাদ, বামপন্থা, কমিউনিজম বা মার্কসপন্থী বলছো এ দর্শনের মূল উৎস মনীষী কার্ল মার্কস। তিনিই এর জনক। জন্মাদাতা। তিনিই এই মার্কসীয় দর্শনের উদ্‌গাতা। পবিত্র গঙ্গার উৎসভূমি যেমন গোমুখ পর্বত। তুষার মৌলি হিমালয়ের অঙ্গভূমি। তেমনি মনীষী কার্লমার্কস হলেন এই দর্শনের উৎস। পিতা। সঙ্গে ছিলেন সাথের সাথী দার্শনিক বন্ধু এঙ্গেলস। ফ্রেড্‌রিক এঙ্গেল্‌স।

পাছে কেউ না ভুল বোঝে, পাছে কেউ না বলে এড়িয়ে যাচ্ছে। আমরা এই তত্ত্বের মূলতত্ত্ব ও সত্য সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করবো। বেশি কথা নয়। বীজ কথা।

সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর একটানা নিরলস, প্রায় নিদ্রাহীন হয়ে একখানা বই লিখেছেন তিনি শ্রান্তিহীন ক্লান্তিহীন সংকল্পে অটল হয়ে। বইটির নাম 'দাস ক্যাপিটাল' (Das Capital)। শ্রমিক-মেহনতি, অবহেলিত, শোষিত, বঞ্চিত মানুষের গীতা-কোরান-বাইবেল। লেখকের নাম? এই আত্মত্যাগী স্বার্থত্যাগী মানুষের নাম কার্লমার্কস। তাঁর নাম থেকেই 'মার্কসবাদ' শব্দের জন্ম। তাঁরাই মার্কসবাদী বা মার্কসপন্থী যাঁরা এই মতাদর্শে বিশ্বাসী। সমর্থক। এই মতের ফলিত দর্শনের রূপকার।

আর 'কমিউনিজম'?

এককথায় চরম সাম্যবাদ। তার ইতিহাস অতি দীর্ঘ। আয়তন বহুধা বিস্তৃত। নানা শাখাপ্রশাখা। মূল বীজকণা এক হলেও তার নানা ভাব। নানা আকার। প্রকার ও প্রকরণ। দেশে দেশে তার নানা ভাবের ঘর। চিত্রিত। বিচিত্রিত। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে তার নানা আবরণ। নানা আভরণ। প্রয়োগের বিভিন্নতা। ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা।

নাতিদীর্ঘভাবে বলতে গেলে বলতে হয় মার্কসিজম-এর মতো 'কমিউনিজম' তত্ত্বের জন্মাদাতাও মূলত জার্মান মনীষী কার্লমার্কস। তিনিই এই তত্ত্বের আদি পিতা। প্রণেতা।

কার্লমার্কস প্রথম জীবনে ভাববাদী মহান জার্মান দার্শনিক হেগেলের শিষ্য ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি গুরু হেগেলের মতবাদকে অস্বীকার করে এক স্বতন্ত্র বস্তুবাদী দর্শনের প্রবক্তা হয়ে ওঠেন। তাঁর এই নতুন মতবাদ ছিল জার্মান রাজশক্তির স্বার্থপরিপন্থী। জার্মানির রাজশক্তির রুদ্র রাজরোষে তিনি জার্মান থেকে বিতাড়িত হলেন। এসে আশ্রয় নিলেন ফ্রান্সে। স্বভূমি থেকে বিতাড়িত হলেন বটে কিন্তু

অন্তরতাড়িত ভাবনাকে তাড়না করলেন না। তাকে লালন করতে লাগলেন পরম যত্নে। একান্ত মমতায়। মেধা ও মননের নিবিড় ঘন সংযোগে তিনি তিল তিল করে গড়ে তুললেন তাঁর ভাবনার তিলোত্তমাকে। সমাজতন্ত্রের সর্বোত্তম রূপ। বিজ্ঞানস্মত রূপ। ভাবের আবেগে নয়। অমৃত যুক্তির পারম্পর্যে ধীরে ধীরে মূর্ত হচ্ছে তার মনের নিহিত গর্ভগৃহের অমূর্ত ভাবনা। ধনতন্ত্রে শ্বাসরোধকারী মৃত্যু ঘণ্টাধ্বনি শ্রমিকতন্ত্র। শ্রমজীবী মানুষের অভয় পাঞ্চজন্য। নিপীড়িত, শোষিত মানুষের হাতে দধিচীর বজ্র। ভুখা মিছিলের মৃতপ্রায় মানুষের কানে কানে শোনালেন নতুন সূর্য উদয়ের গান। পৌষপাবনের গান। নতুন দিনের গান– 'কমিউনিজম'।

কমিউনিজমের একটি জন্ম ইতিহাস আছে। ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে কার্লমার্কস তখন ফ্রান্সে। গভীর অধ্যয়নে রত। আপন বীক্ষণে আত্মমগ্ন। আত্মলীন। শোষিত, নিপীড়িত মানুষের মুক্তির ভাবনায় ব্রতী। কখনও সাফল্যের স্বপ্নে মনের মাঝে অভ্রভেদী ধ্বজা। কখনও বা দুশ্চিন্তার ধুম্রজালের আবেষ্টনে বিব্রত। রাত নিদ্রাহারা। দিন উদ্‌বেগ আর উৎকণ্ঠায় ভরা। এমন সময়ে বন্ধু এঙ্গেলস এসে যোগ দিলেন মার্কসের সঙ্গে। মণিকাঞ্চন যোগ। মার্কস ভাবনার দোসর পেলেন। সঙ্গের সাথী পেলেন। এঙ্গেলস শুধু ধনবান নন, তিনিও মার্কসের ধ্যানে ধ্যানবানও বটে। মার্কসের ভাবনার অনুপ্রেরণায় তিনি অনুপ্রাণিত। উজ্জীবিত। উদ্বেলিত। দু-জন সমভাবের ভাবী–সঙ্গের সঙ্গী। দু-জনে মিলে একটা পার্টি বা সেল গঠন করেন নিজেদের মতবাদ প্রচার করার জন্যে। নিজেদের মনের মণিকোঠায় অবস্থিত কুসুম ভাবনার ভাব বিকশিত করার জন্য। এই সেলের বা পার্টির নাম দিলেন League of Communists।

আবার নাটকীয়ভাবে মার্কসকে ফ্রান্স ত্যাগ করতে বাধ্য করা হলো। মার্কস সব সহ্য করবেন। কিন্তু স্বপ্ন সওদা করবেন না। তিনি পাড়ি দিলেন ইংল্যান্ডে। কিন্তু এঙ্গেলসের সঙ্গে যোগাযোগ ও বন্ধুত্ব অটুট রইল। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে মার্কস ও এঙ্গেলস নিজেদের মতবাদ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে একটি ইস্তাহার প্রচার করেন–"Manifests of the Communist Party"। এই ইস্তাহারের হাত ধরে বহু দীর্ঘপথ ও উজান পাড়ি দেওয়ার স্বপ্ন নিয়ে জন্ম নেয় দুটি দুনিয়া কাঁপানো

শব্দবন্ধ—'কমিউনিস্ট' ও 'কমিউনিজম'। 'কমিউনিস্টদের' মত ও পথ কমিউনিজম। এবং কমিউনিজমের নীতি ও আদর্শে দীক্ষিত ও শিক্ষিত মানুষেরা হলেন 'কমিউনিস্ট'।

ইস্তেহারের বিষয়বস্তু কি কি? ইস্তেহারের বহুবিধ বিষয়ের মধ্যে প্রথমেই বলা হবে 'ধনতন্ত্রের' (Capitalism) কুফলের নানা দিক ও দৃষ্টান্ত। দেখানো হলো শ্রমিকশ্রেণি (যারা শ্রমের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন) বুর্জোয়া শ্রেণির (যারা অন্যের শ্রমে মুনাফা লোটে—পরগাছা) দ্বারা দৃশ্য ও অদৃশ্য নানাভাবে শোষিত হচ্ছে।

দ্বিতীয় যে বিষয়টির ওপর জোর দেওয়া হলো তা 'ধনবৈষম্য'। বলা হলো পৃথিবীর ইতিহাসে যত রক্তক্ষয়ী ও মর্মন্তুদ যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছে তা সবই শ্রেণিসংগ্রাম। আহার্য আহরণ ও সম্পদ রক্ষার লড়াই। রাজায়-প্রজায় লড়াই। শ্রমিক-মালিকের লড়াই। শোষক ও শোষিতের লড়াই।

যতদিন এই বর্ণবৈষম্য থাকবে ততদিন শান্তি অধরা থাকবে পৃথিবীর বুকে। পৃথিবীতে শান্তি ও সুস্থিরতা আনতে গেলে প্রথমেই চাই এই ধনবৈষম্যের পরিপূর্ণ বিলোপ। এই বৈষম্যের বিষমতা ঘোচানোর জন্য ধনিক ও বণিক শ্রেণির হাত হতে উদ্বৃত্ত অর্থ ছিনিয়ে নিয়ে সকলের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করতে হবে। আর এ বিলি বণ্টন কোনো আবেদন নিবেদনে নয়। কোনো শান্তিপূর্ণ উপায়ে নয়। কোনো সালিশী প্রথায় নয়। একাজ করতে হবে আন্দোলনের মাধ্যমে। বিদ্রোহের মাধম্যে। বিপ্লবের মাধ্যমে। তার জন্যে দ্বন্দ্বে আপত্তি নেই। আপত্তি নেই সংগ্রামে। এমনকি রক্তপাতেও। এবং এই কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে দশটি সুনির্বাচিত উপায়ের কথা বলা হলো এই সুনির্দিষ্ট ইস্তাহারে—

১। কোনো সম্পত্তির ব্যক্তি মালিকানা থাকবে না। দেশের সমস্ত সম্পত্তি হবে রাষ্ট্রের বা সর্বসাধারণের।

২। আয়করের উচ্চমাত্রা নির্ধারণ।

৩। ভূসম্পত্তির উত্তরাধিকার আইন বিলোপ।

৪। ব্যক্তি মালিকানার সমস্ত ধনসম্পদ বাজেয়াপ্ত।

৫। দেশের সমস্ত আয় রাষ্ট্রের আয় হিসাবে গণ্য হবে।

৬। যাতায়াত ব্যবস্থা পুরোপুরি রাষ্ট্রের আয়ত্তাধীন হতে হবে।

৭। নির্দিষ্ট ও সুচিন্তিত পরিকল্পনা করে জমির উর্বরতা শক্তি বাড়াতে হবে এবং রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে দেশজ শিল্প ও কৃষির উন্নতি ও বিস্তার ঘটাতে হবে।

৮। কর্মক্ষম সবাইকে কাজ করতে হবে।

৯। কৃষি ও শিল্পের সুষম সমন্বয় শহর ও গ্রামীণ জীবনের আর্থিক অসাম্য দূরীকরণ ও জনসংখ্যাকে গ্রাম ও শহরের মধ্যে আনুপাতিক হারে ছড়িয়ে দিতে হবে।

১০। নতুন নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন। শিশু শ্রম রদ এবং শিক্ষা ও শিল্পের মধ্যে প্রায়োগিক যোগসাধন করতে হবে।

আরও বলা হলো অধিকার অর্জন করতে হয়। ছিনিয়ে নিতে হয়। আবেদন নিবেদনের ঝুলি নিয়ে অধিকার আদায় সম্ভব নয়। তাই চাই বিপ্লব। প্রচলিত ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। তার জন্যে যদি রক্ত ঝরে, রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম হয় হোক। সর্বস্ব পণ। আমৃত্যু সংগ্রাম। শ্রমজীবী মানুষের শৃঙ্খল ছাড়া হারানোর আর কিছু নেই। কিন্তু জেতবার জন্য গোটা পৃথিবীর ভুবন ভাঙার মাঠ। মাভৈঃ। কদম কদম বাড়ায়ে যা। জয় সুনিশ্চিত। উপসংহারে বলা হলো—"Working men of all countries unite." সকল দেশের শ্রমজীবী মানুষ সংঘবদ্ধ হও। এক হও। ঐক্যবদ্ধ হও। ইস্তেহারের ডাক ছড়িয়ে পড়ল দিক থেকে দিগন্তে। পথে প্রান্তরে। প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে—"এ আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে। সবখানে। সবখানে।"

১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে ৬৫ বছর বয়সে ইংল্যান্ডে মারা গেলেন মার্কস। প্রায় অর্ধাহারে। অনাহারে, দুশ্চিন্তায়। The King is dead–Long live the King. দর্শনের রাজা মরে গেছেন। কিন্তু দর্শনের দীপ্তি দিকে দিকে দেদীপ্যমান। দর্শনের মশাল বয়ে নিয়ে চললেন অকৃত্রিম বন্ধু ও সহকর্মী এঙ্গেলস। দাস ক্যাপিটেলের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের জন্য মার্কস অনেক তত্ত্ব ও তথ্য জোগাড় করলেন। কিন্তু মৃত্যু তাঁর জীবন কেড়ে নিল। ফলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড সম্পূর্ণ করলেন বন্ধু এঙ্গেলস।

বিপ্লব–আদর্শ–দর্শন হঠাৎ পথের মাঝে পথ হারানোর দশা। প্রায় সমস্ত দর্শনে যেমন হয়। যুক্তি-প্রতিযুক্তি। ব্যাখ্যা-প্রতিব্যাখ্যা। পথ চলতে চলতে পথ দ্বিধাবিভক্ত। একদল নরমপন্থী। তাঁরা চাইলেন শান্তিপূর্ণ আন্দোলন। নিরলস প্রচারের মাধ্যমে প্রচলিত পুঁজিবাদকে হঠাতে চাইলেন। আর একদল চরমপন্থী। তাঁরা আবেদন নিবেদন নয়। আপস আলোচনা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন নয়। তাঁরা চাইলেন সংগ্রাম। সংঘর্ষ। তাঁরা চাইলেন পুঁজিবাদের সার্বিক ধ্বংস। হিংসা, রক্তপাতে ভ্রূক্ষেপহীন। দেশে দেশে মার্কসপন্থীদের মধ্যে মতভেদ। মতান্তর। কখনো কখনো মনান্তর।

অবশেষে এই বিপ্লবের বাণী রাশিয়াতে আত্মপ্রকাশ করল মার্কসবাদী মহামতি লেলিনের বলিষ্ঠ হাত ধরে। তিনি বললেন, বিপ্লব ও রক্তপাত ছাড়া পুঁজিবাদের ধ্বংস অসম্ভব। আবেদন নিবেদন পন্থী মেনশেভিকদের সঙ্গে সহমত পোষণ করলেন না। গড়ে তুললেন, 'বলশেভিজম'। কেড়ে নিলেন রাশিয়ার জারের হাত থেকে ক্ষমতার রশি। শুরু হলো রাশিয়ার নয়া ইতিহাস। কমিউনিস্ট শাসনের পথ চলা। লেলিনই তার পুরোধা পুরুষ। লেলিনই কমিউনিজমের প্রয়োগ পিতা। কার্যকরী প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর ধর্ম নাস্তিকতা। তাঁর ধর্ম মার্কসীয় তত্ত্বের পরিপূর্ণ প্রয়োগ।

লেলিন বললেন–মার্কসবাদ সত্য, সেই হেতু তা সর্বশক্তিমান। মার্কসবাদ পরিপূর্ণ দর্শন, তাই ইহা সুসমঞ্জস ও সুসম্পূর্ণ। তিনি একথা জোর দিয়ে বললেন, ক্ষমতা লাভের সংগ্রামে সংগঠন বা পার্টি ছাড়া সর্বহারাদের আর কোনো অস্ত্র নেই। লেলিনের পর রাশিয়ার কমিউনিজমের হাল ধরলেন যোশেফ-স্ট্যালিন। দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলল মহান মার্কসের দর্শনের বাস্তব প্রয়োগ। প্রাচ্যে এই দর্শনের রথের রাশ ধরলেন মূলত চিনের দূরদর্শী নেতা মাও-সে-তুঙ। প্রয়োগকৌশলে তিনি পুরোপুরি রাশিয়ার নীতি প্রয়োগ করলেন না। চিনের বাস্তবতা মেনে তিনি চিনের কৃষকদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সর্বহারার শাসন প্রতিষ্ঠা করতে। তিনি বলেছিলেন–বৈপ্লবিক আন্দোলন আমদানি বা রপ্তানি করা যায় না। তিনি গঠন করলেন 'চাইনিজ কমুউনিস্ট পার্টি'। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করলেন— প্রত্যেকটি সাম্যবাদীকে এই সত্য গ্রহণ করতে হবে যে—বন্দুকের নলই হলো ক্ষমতার উৎস। মার্কসবাদীরা বেরিয়ে পড়লেন–দেশে দেশে মোর ঘর আছে। আমি সেই দেশ লব

যুঝিয়া—এই মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে। বেরিয়ে পড়লেন দিকে দিকে মন্দ্রস্বরে ঘোষণা করতে করতে..... আর তাহলে 'বামপন্থী' কারা?

গীতাধ্যানীরা উত্তর দিলেন, বস্তুত 'বামপন্থী' শব্দবন্ধের কোনো তত্ত্বগত অর্থ নেই। যেমন নেই আমাদের দেশের নাম হিন্দুস্থান শব্দজোড়ের কোনো ব্যুৎপত্তিগত ধর্মীয় অর্থ। মধ্য এশিয়া ও পাশ্চাত্যবাসীরা সিন্ধু নদের অপর প্রান্তে বসবাসকারী মানুষদের হিন্দু ও তার ভূখণ্ডকে 'হিন্দুস্থান' বলে উল্লেখ করত। কেননা, সিন্ধুর অপর প্রান্তে অবস্থিত মানুষজন সিন্ধুস্থানী উচ্চারণ করতে পারেনি কারণ তাদের 'স' শব্দটির 'হ' হিসাবে উচ্চারিত হতো। তাই 'সিন্ধুস্থান'-এর বদলে হিন্দুস্থান। পরে শব্দটি নিজস্ব মাহাত্ম্য লাভ করে।

তেমনিভাবে বামপন্থী শব্দটির কোনো দার্শনিক তত্ত্বের মাপকাঠিতে সৃষ্টি হয়নি। এই মানিকজোড় শব্দটির উৎপত্তি ঘটনাচক্রে। কোনো উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নয়। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি বিপ্লবের সময় 'বাম' বা ইংরাজি Left শব্দটির উৎপত্তি। তখন পার্লামেন্টে সভাপতির ডানদিকে বসতেন ক্ষমতাসীন বা শাসক দল। বামদিকে বসতেন বিরোধী দল। বামদিকে বসার জন্য তাঁদের বলা হতো 'বামপন্থী' বা Leftist। বর্তমানে 'বামপন্থী' শব্দবন্ধটি শুধু আভিধানিক নয় সাংবিধানিক মর্যাদা ও গুরুত্ব লাভ করেছে। এখন মূলত যাঁরা সাম্যবাদী ও সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শী তাঁদেরকে বামপন্থী বলে অভিহিত করা হয়। যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী ব্যবহারও আছে।

মার্কস বা কমিউনিস্টদের তাহলে মূল লক্ষ্য কি? গীতাধ্যানীরা বললেন, তাদের লক্ষ লক্ষ্য। তবে মূল লক্ষ্য হলো ঈশ্বরহীন সমাজ—শ্রেণিহীন সমাজ।

মার্কস তথা কমিউনিস্টরা মনে করেন বিশ্ব সৃষ্টিতে ঈশ্বর, ভগবান, আল্লাহ্ বা God বলে অতিপ্রাকৃত ও অতিন্দ্রিয় কোনো শক্তির হাত নেই। এসব মোল্লা মৌলবী, ব্রাহ্মণ, পাদ্রীদের নিজেদের স্বার্থে প্রচারিত আষাঢ়ে গল্প। যুক্তিহীন জল্পনা। অবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। তাঁরা ডারউইনের বিবর্তনবাদে ঘোর বিশ্বাসী। বিশ্ব প্রকৃতি রূপ পরিবর্তন করতে করতে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। এবং মানুষ ক্রম বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে 'অ্যামিবা' থেকে বর্তমান সভ্য মানুষ হয়েছে। এর পিছনে অন্য কোনো অদৃশ্য শক্তির অবস্থান নেই।

❁ ধর্মহীন সমাজ :

তাঁরা মনে করেন ধর্ম মানুষের জীবনে আফিং। মাদকদ্রব্য। প্রয়োজনহীন যুক্তিহীন এক আবেগ। কিছু সুবিধাভোগী মানুষ নিজেদের স্বার্থে তা ব্যবহার করেছেন অন্যকে শাসনের জন্য। শোষণের জন্য। এটা ভাববাদের কথা। ভাববাদের ঘেরাটোপ। অধ্যাত্মবাদীদের মনগড়া ফানুস। অস্তিত্বহীন। অবয়বহীন। প্রয়োজনহীন এক জগদ্দল পাথর। তাঁরা জড়বাদে বিশ্বাসী।

তাহলে জড়বাদ কি? তাঁরা বললেন, পৃথিবীর বস্তুজগৎ আপন অন্তর্নিহিত শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে প্রকাশ পাচ্ছে নিত্যনতুন রূপে ▸যাচ্ছে রূপে থেকে রূপান্তরে । ঘটছে বিবর্তন। নব নব কলেবর লাভ করছে। বস্তুই স্রষ্টা। বস্তুই সৃষ্টি। বস্তুই নিত্য। বস্তুই সত্য। পৃথিবী বস্তুময়। বস্তু ছাড়া আর কিছুই সত্য নয়। সবই অলীক। ভ্রমাত্মক বিভ্রম। ধর্ম দুর্বল মনের ধারণা। চৈতন্য চিৎশক্তি মিথ্যার বুদ্‌বুদ। শ্রমিকের শক্তিহরণকারী মাদবদ্রব্য।

মার্কসবাদের প্রথম বাস্তব প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠাতা মহামতি লেলিন তাঁর 'Religion' গ্রন্থের প্রায় শুরুতেই বললেন–Aetheism is a natural and inseparable part of Marxism, Marxism cannot be conceived without aetheism. (নাস্তিকতা মার্কসবাদের স্বাভাবিক ও অপরিহার্য অংশ। নাস্তিকতা ছাড়া মার্কসবাদ বোঝা অসম্ভব।)

একবার তিনি সেন্ট পিটার ও সেন্ট পলের ক্যাথিড্রাল পরিদর্শন করতে যান। সেখানকার পাদ্রী অভ্যাসমতো এক হাতে বাইবেল ও অন্যহাতে ক্রুশ নিয়ে প্রার্থনা করতে আরম্ভ করলে মহামতি লেনিন রেগে আগুন, তেলে বেগুন। তিনি পাদ্রীকে ধমক দিয়ে বললেন— "Stop this buffonery. The power of the working classes come from no 'Gods' but from workship, ploughs, from sweat of body. Enough of your fables about Gods. We want no more of the opium which binds the will of the people. There is no Gods on earth or in heaven."

(ভাঁড়ামি বন্ধ করো। শ্রমিকশ্রেণির শক্তি কোনো ঈশ্বরের দান নয়। এ শক্তি আসে কলকারখানা থেকে। এ শক্তি আসে–লাঙল থেকে। ঘাম থেকে। মিথ্যে গল্প

অনেক হয়েছে। আর নয়। মানুষ স্বাধীন ইচ্ছার প্রতিবন্ধক এই আফিং আমরা আর খেতে চাই না। পৃথিবীতে বা স্বর্গে ঈশ্বর বলে কেউ নেই।)

শুধু ধর্ম নয়। তিনি শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে কোনো কিছুকেই পাত্তা দিতে রাজি ছিলেন না। না ন্যায়। না নীতি। একবার বিখ্যাত রুশ সাহিত্যিক ম্যাক্সিম গোর্কি লেলিনের কর্ম পদ্ধতিতে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন–আপনি কোনো নীতি মানেন কি? উত্তরে লেলিন বলেন–Who ever told you, comrade, that I had principle or believe in morality?

–কে তোমায় বলেছে বন্ধু, যে আমি কোনো নীতি বা আদর্শ মেনে চলি? আরও জোরালো কণ্ঠে তিনি তাঁর 'Religion' গ্রন্থে লিখলেন–"The Marxist must be a materialist i.e., an enemy of Religion" (মার্কসবাদী হবে জড়বাদী, ধর্মের শত্রু)।

❁ শ্রেণিহীন সমাজ :

সমাজে কোনো শ্রেণিবৈষম্য থাকবে না। তাঁরা বলেন প্রত্যেক মানুষই সমান এবং জন্মগতভাবে স্বাধীন। এই যে ভেদাভেদ-এ সুবিধাবাদীদের ভেদনীতি। এ প্রভেদ মানুষের সৃষ্টি। সমাজে সবাইকে শ্রম দিতে হবে। 'No work no bread' —কাজ না করলে খেতে পাবে না। আমির ওমরাহ–রাজা বাদশা বলে কেউ থাকবে না। খেতে হলে খাটতে হবে। কিভাবে সেই শ্রম ও খাদ্যের বণ্টননীতি হবে? মার্কসবাদীরা বললেন, each according to his or her capacity and need.'

সাধ্যমতো শ্রম দেবে। প্রয়োজন মতো নেবে। ধনতন্ত্রে, যে চাষের অধিকারী অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে গ্রাসের অধিকারী ছিল না। এই প্রথাকে একেবারে সমূলে বিনষ্ট করে দিলেন তাঁরা। এবং সেই সঙ্গে ঘোষণা করলেন--Rule of the proletariat। শ্রমজীবীর শাসন। শ্রমিকশ্রেণির শাসন। কোনো রাজা উজির নয়। অমাত্য ওমরাহ নয়। বিশেষ কোনো শাসকশ্রেণি নয়। এবং তাদের হাত ধরে কোনো শোষকশ্রেণি নয়। শ্রমিকদের মধ্য থেকে শ্রমিকদের স্বার্থে শ্রমিকরাই শাসন করবে। 'আমরা সবাই রাজার দেশের নীতি'।